# পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্প

সুনীল জানা

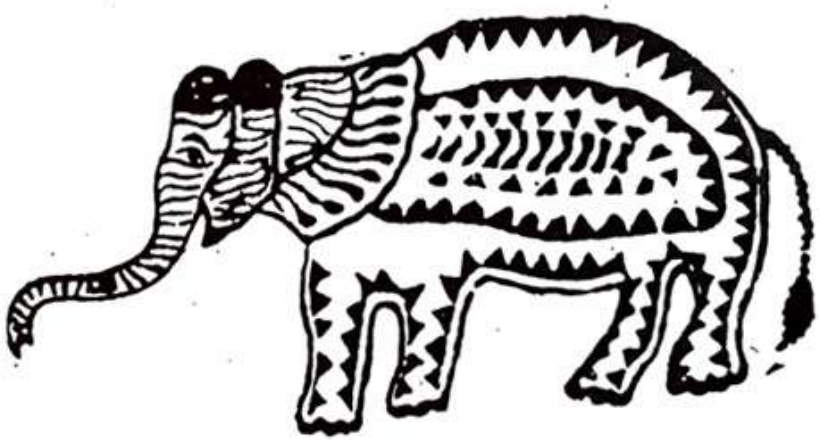

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

# বলার কথা

গল্প পড়তে শুনতে কে না ভালবাসে! আর পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের দু-চারটে গল্পও পড়ে নি, শোনে নি বা জানে না, এমন মানুষ শুধু শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে কেন, নিরক্ষর লোকদের মধ্যেও খুব কম পাওয়া যাবে। তার কারণ, এ সব গল্প যে কতকাল ধরে কত ভাবে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ঠিক নেই। শুধু আমাদের মধ্যে কেন, পৃথিবীর নানাদেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, তাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে জড়িয়ে আছে এই চিরকালীন গল্পগুলি।

আজ থেকে কম করেও দেড় দু'হাজার বছর আগে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি। সারা পৃথিবীর সমগ্র গল্প—সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের নাম সর্বাগ্রে। এর আগে এমন কোন গল্পসাহিত্য আর কোথাও রচিত হয় নি। এসব গল্পের জগৎজোড়া জনপ্রিয়তারও কোন তুলনা নেই। বাইবেলের পর আর কোন গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের মত এমন বহুল প্রচার লাভ করে নি। অন্ততপক্ষে ৫০ টি ভাষায় দুশোরও বেশি সংস্করণ বেরিয়েছে এই পঞ্চতন্ত্রের। শুধু বাংলাভাষাতেই হয়তো পঁচিশ তিরিশটা। এই বইটা নিয়ে তার সংখ্যা বাড়ল আরো একটি।

আসলে এই গল্পগুলোর আবেদন যেমন সর্বকালীন তেমনি সর্বজনীন। এই গ্রন্থের রচয়িতা বিষ্ণুশর্মা শুধুমাত্র এক অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন না, ছিলেন গভীর জীবনবোধসম্পন্ন এবং রসবোধসম্পন্ন এক ঋষিতুল্য মানুষ। অবশ্য বিষ্ণুশর্মার ঐতিহাসিকত্ব আজো নির্ণীত হয় নি। তবে তাঁর রচনা থেকে অনুমিত হয়, দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর রচনা স্থান কাল পাত্র ইত্যাদি কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকে নি। সব কিছুর সীমা ছাড়িয়ে সরল প্রসাদ গুণে এক চিরায়ত সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। যে কোন মহৎ সত্যের মতই এই রচনাগুলি যেমন চির পুরাতন, সেইসঙ্গে আবার চির নূতনও।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্পগুলির অধিকাংশ চরিত্রই পশু পাখি সাপ ব্যাঙ মাছ কচ্ছপ ইত্যাদি মনুষ্যেতর প্রাণী, কিন্তু তাদের আচার আচরণে আশ্চর্য ভাবে ছায়া ফেলেছে মানুষের জীবনযাত্রার ধারা। ছোটরা যেমন গল্পগুলির মধ্যে খুঁজে পাবে গল্পের মজা, তেমনি নিজেদের অজ্ঞাতসারে হয়তো বুঝতে শিখবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি-প্রকৃতি। একটু একটু করে সচেতন হয়ে উঠবে জীবনের নানা ভাল মন্দ, সত্য-মিথ্যা, উচিত অনুচিত সম্পর্কে। আর সেখানেই গল্পগুলির শিল্পমণ্ডিত সত্যতা।

নবতর কথক হিসেবে এবার নিজের কথায় আসি। বিষ্ণুশর্মার গল্পগুলির অনুবাদ করি নি আমি, বলতে চেয়েছি একেবারে নিজের মত করে। তাই লেখার সময় স্বাধীনতা আমাকে একটু বেশিই নিতে হয়েছে, অবশ্য মূল রচনাকে বিকৃত বা পরিবর্তিত করি নি কোথাও। শিল্পগুণের অভাব না থাকলেও বিষ্ণুশর্মার রচনা ছিল মূলত নীতিকথা-প্রধান। সেগুলিকে ছোটদের কাছে অধিকতর রম্য করে তোলার জন্যই আমার এই ইচ্ছাকৃত স্বাধীনতা গ্রহণ।

প্রাচীন সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের রচনারীতিতে লক্ষ্য করা যায়, সেখানে গল্পের মধ্যে আর এক গল্প, তার মধ্যে আবার এক গল্প। এমনি করে গল্পের পর গল্প বা গল্পের মধ্যে গল্প সাজিয়ে গল্পের মালা গাঁথা হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রও সেই একই ভঙ্গিতে লেখা। ছোটদের পক্ষে গল্পের রসগ্রহণে এই রচনাভঙ্গিটা কিছু অসুবিধাজনক ও জটিল বলে মনে হয়েছে আমার। তাই গল্পগুলোর একটার থেকে আরেকটাকে ছড়িয়ে সরিয়ে প্রতিটি গল্পকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছি। এতে গল্পগুলির স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কোন হানি ঘটে নি বলেই আমার ধারণা। তবে পঞ্চতন্ত্র থেকে কয়েকটি গল্প বাধ্য হয়ে আমাকে বাদ দিতে হয়েছে এখানে, কেননা সেগুলি কোনক্রমেই ছোটদের উপযোগী নয়। তবে এতগুলি গল্পের মধ্যে সেগুলির সংখ্যা কতিপয় মাত্র।

পঞ্চতন্ত্রের মত হিতোপদেশও পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মারই রচনা। তবে হিতোপদেশে মৌলিক গল্পের সংখ্যা খুবই কম। বেশির ভাগ গল্পই পঞ্চতন্ত্র থেকে নেওয়া, তবে কোথাও কোথাও সামান্য অদলবদল করা হয়েছে—এই যা। সুতরাং হিতোপদেশ অংশে সেগুলো আর দ্বিতীয়বার যুক্ত করি নি।

প্রত্যেকটি গল্পের শেষে যে টুকরো কবিতা বা ছড়া যুক্ত হয়েছে, বলা বাহুল্য সেগুলি বিষ্ণুশর্মার মহৎ রচনার অংশ নয়। সেগুলি সম্পূর্ণভাবে আমারই অর্বাচীন সংযোজন।

সুনীল জানা

# গল্পমালা

বলে গেছেন বিষ্ণুশর্মা — ৭


| | |
|---|---|
| **মিত্রভেদ** | **৯—২৮** |
| এক কাকের চার বন্ধু | ১১ |
| বৈরাগী ইঁদুর | ১৯ |
| হিসেবি শেয়াল | ২২ |
| কর্মপুরুষ ও ভাগ্যপুরুষ | ২৪ |
| **মিত্র লাভ** | **২৯—৯২** |
| শয়তান শেয়াল | ৩১ |
| বাঁদরের বাঁদরামি | ৪০ |
| শেয়ালের বুদ্ধি | ৪৩ |
| কাকের বন্ধু শেয়াল | ৪৬ |
| বকের বজ্জাতি | ৪৯ |
| খরগোশ বাহাদুর | ৫৩ |
| উকুন আর ছারপোকা | ৫৮ |
| নীলরঙের শেয়াল | ৬০ |
| উটের মরণ | ৬৪ |
| তিতিরের ডিম | ৬৮ |
| বোকার বোকা | ৭১ |
| তিনটে মাছ | ৭৪ |
| ব্যাঙের লাথি | ৭৭ |
| উল্টো ফল | ৮০ |
| বকের বোকামি | ৮২ |
| বটগাছ সাক্ষী | ৮৪ |
| বোকা বাঁদর | ৮৮ |
| সেয়ানে সেয়ানে | ৯০ |
| **কাকোলুকীয়** | **৯৩—১৩০** |
| কাকে পেঁচায় | ৯৫ |
| কাকের বুদ্ধি | ৯৮ |
| বুদ্ধিমান খরগোশ | ১০২ |
| বেড়াল তপস্বী | ১০৫ |
| পাঁঠার ভোজ | ১০৮ |
| এক যে ছিল সাপ | ১১১ |
| একজোড়া পায়রা | ১১৪ |
| মাঝরাতে গোলমাল | ১১৭ |
| ইঁদুরানির বিয়ে | ১২০ |
| শেয়ালের গুহায় সিংহ | ১২৬ |
| সাপের পিঠে ব্যাঙ | ১২৮ |

| | |
|---|---|
| **লব্ধ প্রণাশ** | **১৩১—১৫২** |
| বানরের কল্‌জে | ১৩৩ |
| বোকা ব্যাঙ | ১৩৬ |
| গাধার মগজ | ১৩৯ |
| শেয়ালের দাদাগিরি | ১৪২ |
| আর এক যুধিষ্ঠির | ১৪৫ |
| গাধার গান | ১৪৭ |
| সাবাস শেয়াল | ১৫০ |
| **অপরীক্ষিত কারক** | **১৫৩—১৮৮** |
| সোনার সাধু | ১৫৫ |
| হতভাগা নেউলছানা | ১৫৯ |
| চার বন্ধু | ১৬২ |
| তিন পণ্ডিত ও এক মূর্খ | ১৬৫ |
| একবুদ্ধির বুদ্ধি | ১৬৮ |
| গর্দভ রাগিণী | ১৭১ |
| বোকার বিপদ | ১৭৪ |
| ভাবনার বাহাদুরি | ১৭৭ |
| শোধবোধ | ১৮০ |
| কাঁকড়ার কামড় | ১৮৪ |
| দু-মুখো পাখি | ১৮৬ |
| **হিতোপদেশ** | **১৮৯—২২৪** |
| হাঁসরাজা আর ময়ূররাজা | ১৯১ |
| উপকারী বামুন | ১৯৮ |
| সত্যিকারের বন্ধু | ২০২ |
| বাঘবুড়োর বালা | ২০৫ |
| যেমনকে তেমন | ২০৮ |
| যেই কে সেই | ২১১ |
| বদমাশ বেড়াল | ২১৪ |
| গাধা ও কুকুর | ২১৬ |
| ঘণ্টাকর্ণ দৈত্য | ২১৮ |
| বোকা বেড়াল | ২২১ |
| ভুল শাস্তি | ২২৩ |

# বলে গেছেন বিষ্ণুশর্মা

এক যে ছিল রাজা। তাঁর তিন ছেলে। রাজার কোনো অভাব নেই। তাঁর হাতিশালে হাতি। ঘোড়াশালে ঘোড়া, আর রাজকোষ ভরা ধনদৌলত। পাত্র মিত্র প্রজারা সবাই রাজাকে ভালোবাসে। শত্রুরা যমের মত ভয় করে। পরম সুখে রাজ্যে বাস করে সকলে।

কিন্তু রাজার মনে কোনো সুখ নেই। তাঁর তিনটে ছেলে কেউ মানুষ হলো না। তিনজনেই গণ্ডমূর্খ থেকে গেল একেবারে। খেয়ে দেয়ে সেজেগুজে বেড়িয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাচ্ছে তারা। অনেক বয়স হলো, কিন্তু বিদ্যেবুদ্ধি একফোঁটাও হলো না তাদের।

এমন মূর্খ ছেলেদের নিয়ে কি করবেন তিনি? রাজ্য কার হাতে দিয়ে যাবেন? রাজা খাবার মুখে দিয়ে কোন স্বাদ পান না, শুতে গিয়ে আরাম পান না, ভাবনা চিন্তায় ঘুম আসে না তাঁর চোখে। কাউকে মুখ দেখাতেও লজ্জা করে তাঁর। এমন ছেলেরা থাকার চেয়ে না থাকাই ছিল ভালো।

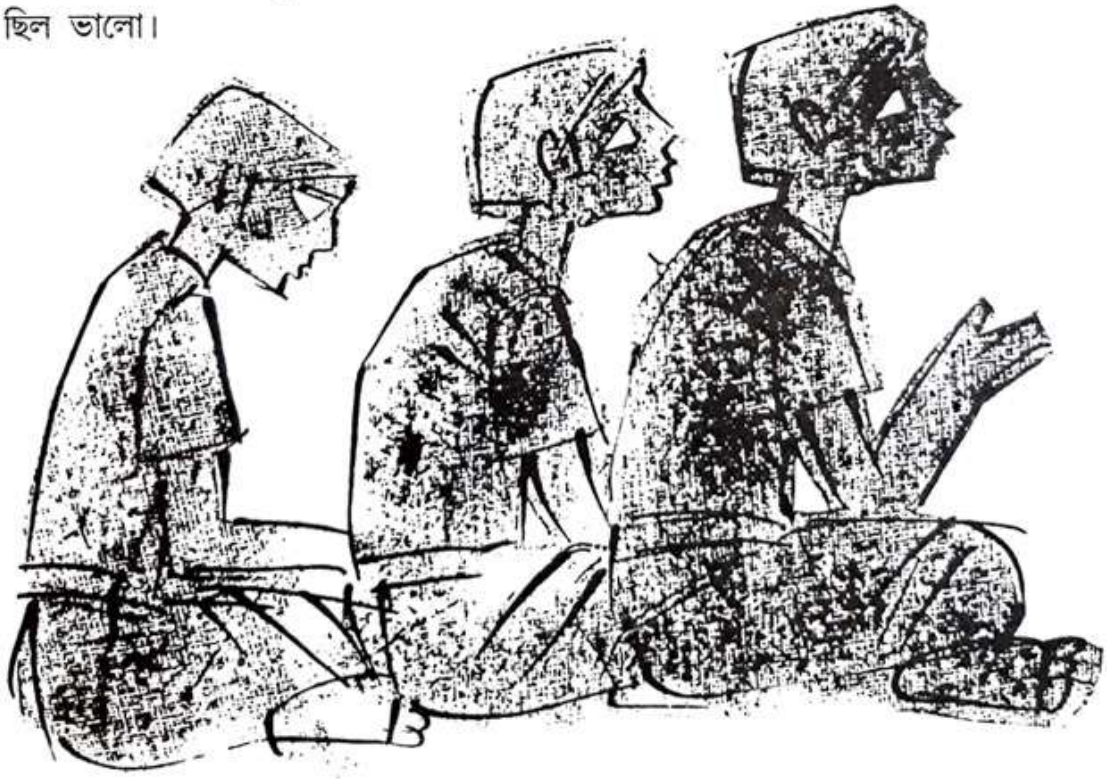

অজাত, মৃত ও মূর্খ পুত্রমধ্যে
ঢের ভাল মৃত অজাতেরা।
স্বল্পকাল দুঃখ তারা দেয়, কিন্তু
চিরকাল জ্বালায় মূর্খেরা॥

একদিন রাজা মন্ত্রীদের ডেকে বললেন, আমার রাজসভায় পাঁচশো জন জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত আছেন। তাঁদের কোনো একটা উপায় বার করতে বলুন, যাতে আমার ছেলেদের একটু জ্ঞানবুদ্ধি হয়। তাঁদের প্রচুর পুরস্কার দেব আমি।

একজন মন্ত্রী তখন বললেন, মহারাজ! আমাদের জীবন দুদিনের, কিন্তু জ্ঞানের কোনো শেষ নেই।

শাস্ত্র বহু, আয়ু স্বল্প, আরো কত বাধার প্রাচীর।
হাঁসের মতন তাই জল ফেলে নিতে হবে ক্ষীর॥

আপনার ছেলেদের জ্ঞানলাভের জন্য একটা সহজ উপায় বার করতে হবে। এখানে বিষ্ণুশর্মা নামে একজন বড় পণ্ডিত আছেন। সব শাস্ত্র তার নখদর্পণে। আপনি তাঁকে বলুন। একমাত্র তিনিই পারবেন অল্প সময়ে আপনার ছেলেদের জ্ঞানবান করে তুলতে।

রাজা তখন সসম্মানে বিষ্ণুশর্মাকে ডেকে আনলেন। বললেন, প্রভু, আপনি দয়া করে আমার ছেলেদের শিক্ষার ভার নিন। দক্ষিণা হিসাবে আমি আপনাকে একশত গ্রাম দান করবো।

বিষ্ণুশর্মা বললেন, মহারাজ! কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি বিদ্যা বিক্রয় করি না। ধনসম্পদে আমার কোনো লোভ নেই। আমার বয়স আশি বছর। আর কদিনই বা বাঁচবো? শুধু আপনার অনুরোধেই আমি এ ভার গ্রহণ করলাম। আজ থেকে ঠিক ছমাসের মধ্যে আমি যদি আপনার ছেলেদের সুশিক্ষিত করে তুলতে না পারি, তাহলে নরকেও আমার গতি হবে না।

রাজার ছেলেদের শিক্ষাদানের জন্য পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা তখন বসলেন গল্প বানাতে। লিখলেন পঞ্চতন্ত্র নামে একটি গ্রন্থ। পঞ্চতন্ত্র মানে পাঁচটি বিষয়। ১. মিত্রভেদ [বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ] ২. মিত্রলাভ [বন্ধুত্ব স্থাপন] ৩. কাকোলুকীয় [কাকে-পেঁচায়] ৪. লব্ধ-প্রণাশ [পেয়ে হারানো] আর ৫. অপরীক্ষিত-কারক [পরীক্ষা না করে বা কারণ না জেনে কাজ করা] ঐ গ্রন্থের সুন্দর সুন্দর গল্পের সাহায্যে তিনি ঠিক ছমাসের মধ্যেই রাজকুমারদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করলেন, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ করে গড়ে তুললেন তাদের। ছোটদের জন্য সহজ সরল কি চমৎকার সব গল্প বলে গেছেন তিনি। সেই গল্পগুলোর আজো কোনো তুলনা নেই।

# এক কাকের চার বন্ধু

নদীর ধারে আদ্যিকালের এক পুরনো শিমূল গাছ। গাছের ছায়ায় আর নদীর জলে মিলে জায়গাটা কী সুন্দর! দুদণ্ড বসে জিরোতে ইচ্ছে করে। হাওয়ায় যখন গাছের পাতা ঝিরঝির করে কাঁপে, আর নদীর জল কুলকুল আওয়াজ তোলে—মিষ্টি ঘুমের আমেজে তখন যেন দুচোখ একেবারে জুড়ে আসে।

এমন জায়গা পেয়ে যতো রাজ্যের পাখি এসে বাসা বেঁধেছে সেই গাছে। কাক, শালিখ, চড়ুই, ময়না, টিয়া—আরো কত। দিন নেই রাত নেই, তাদের কিচির মিচির লেগেই আছে গোটা গাছ জুড়ে। রাত্তিরে তাই তাদের অনেকেরই ভালো ঘুম হয় না। এইভাবেই একদিন ভোর হবার অনেক আগে হঠাৎ লঘুপতনের ঘুম ভেঙে গেল। লঘুপতন হলো সেই গাছের কাকেদের সর্দার। অসময়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সে বিরক্ত হয়ে মগডালে এসে বসলো।

শেষরাত্তিরে তখন চারদিকে বেশ জ্যোৎস্না দিয়েছে। দেখলে মনে হবে, বোধহয় ভোর হয়ে এলো। সর্দার-কাকের তখনো ভালো করে ঘুমের আমেজ কাটে নি। আধ-বোজা চোখে চারপাশে তাকাতে তাকাতে একসময় সে দেখতে পেলো, মস্ত জাল কাঁধে নিয়ে এক শিকারি কোথাও চলেছে নদীর তীর ধরে। অমনি ঘুম ছুটে গিয়ে তার চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো।

শিকারি লোকটাকে এভাবে যেতে দেখে লঘুপতন ভাবলো, আজ যে কার কপালে মরণ আছে, কে জানে। দেখি, শেষপর্যন্ত কে ওর পাল্লায় পড়ে।

গাছের মগডাল ছেড়ে লঘুপতনও ওর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চললো সেই ফিকে জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে লোকটা অনেকদূর এসে শেষপর্যন্ত একটা সবজি খেতের পাশে তার জাল পাতলো। তারপর জালের গায়ে কিছু খাবারের দানা ছড়িয়ে রেখে সে কোথাও আড়ালে চলে গেল। লঘুপতন একটা নিমগাছের ডালে বসে দেখলো সব ব্যাপারটা।

ভোর হতে না হতেই পাখির দল ঝাঁক বেঁধে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো বাসা ছেড়ে। তাদের ভাগ্য ভালো যে জালের খাবার কারোর নজরেই পড়লো না। তারপর মাঠে সবে যখন সূর্যের আলো ফুটতে সুরু করেছে, এমন সময় এক ঝাঁক পায়রা উড়ে এলো সেখানে। দলের একটা পায়রার সেদিকে নজর পড়তেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, দ্যাখ্, দ্যাখ্ কত খাবার এখানে। আজ সকালে যে কার মুখ দেখে উঠেছি!

চিত্রগ্রীব হলো ওদের সর্দার পায়রা। ব্যাপার দেখে সে বললো, তাই তো! কিন্তু মাঠের মধ্যে এতো খাবার এলো কোত্থেকে? আমার কিন্তু কেমন ঠেকছে যেন।

একটা লোভী পায়রা অমনি বলে উঠলো, আরে রেখে দাও তোমার ঠেকাঠেকি। খাবার পেয়েছি যখন, খেয়ে ফেলবো, ব্যস! দরকার হলে তুমি ততক্ষণ ওসব খোঁজ করো গে!

যেমন কথা, তেমনি কাজ। ঝাঁক বেঁধে অমনি সব পায়রা নেমে এলো জালের ওপর। আর খাবার মুখে দেবার আগেই তারা আচমকা সেই ফাঁদে জড়িয়ে গেল।

চিত্রগ্রীব বললো, কেমন! এবার বোঝ ঠ্যালা। তোমাদের লোভের উচিত ফলই হয়েছে।

কিন্তু বললে কি হবে, যা হবার সে তো হয়েই গেছে। দলের সঙ্গে নিজেও সে আটকা

পড়েছে ফাঁদে। খাবার খাওয়া তো দূরের কথা, প্রাণের ভয়ে সবাই তখন তুমুল হুটোপাটি লাগিয়ে দিয়েছে জাল থেকে ছাড়া পাবার জন্য। কিন্তু যতোই লাফাচ্ছে তারা, ততো বেশি করে জালে জড়িয়ে পড়ছে।

তাদের কাণ্ড দেখে চিত্রগ্রীব একটা প্রচণ্ড ধমক লাগালো, কি করছো তোমরা! এমন করলে বিপদ বাড়বে ছাড়া কমবে না। সবাই যে যার জায়গায় চুপ করে থাকো এখন, একটুও নড়বে না, খবরদার!

কে একজন তাদের প্রায় কেঁদেই ফেললো, কিন্তু যে যার প্রাণটা তো বাঁচাতে হবে, সর্দার।

চিন্তিত ভাবে সর্দার পায়রা বললো, তা বৈকি! কিন্তু এখন একলা কেউ বাঁচতে তো পারবে না। বাঁচতে চাইলে দল বেঁধে বাঁচতে হবে। শোনো, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ইঁদুর-রাজ হিরণ্যক আমার অনেককালের বন্ধু। আমরা দল বেঁধে যদি জালসমেত তার কাছে উড়ে যেতে পারি, তবে সে জাল কেটে আমাদের বাঁচাতে পারে। কেমন, রাজি?

রাজি। একশো বার রাজি! এক—দুই—তিন—

শিকারি ফিরে আসার আগেই তারা জালসুদ্ধ সোঁ সোঁ করে আকাশে উড়ে গেল। লঘুপতন দেখলো, এ তো ভারি মজার ব্যাপার। দেখি, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

সে-ও অমনি তাদের পেছন পেছন সেদিকে উড়ে চললো।

ইঁদুর হিরণ্যক থাকে ছোট একটা বনের ধারে। সে সময় গর্তের মুখের কাছে বসে কুটুস কুটুস করে কি একটা ফল সে দাঁতে কাটছিল মনোযোগ দিয়ে। পায়রাদের ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসার সাঁই সাঁই আওয়াজ যেই শোনা, অমনি সে চমকে গিয়ে এক ছুটে ঢুকে পড়লো গর্তের মধ্যে। মুখের ফল তার গর্তের মুখেই পড়ে রইলো।

দলবল সহ সেখানে নেমে চিত্রগ্রীব হাঁক পাড়লো, কই গো ইঁদুর ভায়া, বাড়ি আছ নাকি?

আরে, এ তো বন্ধু চিত্রগ্রীবের গলা! অতি-পরিচিত ডাক শুনেই হিরণ্যকের ভুল ভেঙ্গে গেল। অমনি সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে দৌড়তে দৌড়তে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল।

ও হরি, মিতা যে! বাপস্, কদ্দিন পরে দেখা! কিন্তু তোমাদের আসার শব্দ শুনে যা ভয় পেয়েছিলাম একখানা। তারপর? একেবারে দলবল নিয়ে যে। খুশিতে ডগোমগো হয়ে এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলতে গিয়ে হিরণ্যক হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ জালটার দিকে চেয়ে থেকে অবাক হয়ে শুধালো, এ কি, তোমাদের এমন দশা হলো কেন শুনি?

চিত্রগ্রীব একবার দলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো, আর বলো কেন, মিতে! দোষ আমাদেরই। এখন তুমি ছাড়া আর আমাদের গতি নেই।

দলের পায়রারা সবাই বোকার মতো এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। বলে

কি সর্দার! একরত্তি একটা পুঁচকে নেংটি ইঁদুর! এতোগুলো পায়রাকে সে খালাস করতে পারবে জাল থেকে? সর্দারের মাথা খারাপ হলো না তো!

হিরণ্যক আর দেরি করলো না। কি যে বলো, এ আর বেশি কথা কি—বলতে বলতে দৌড়ে এলো আগে চিত্রগ্রীবের পায়ের জাল কাটার জন্য। চিত্রগ্রীব অমনি হাঁ হাঁ করে উঠলো, করো কি মিতে। আগের সবার তো হয়ে যাক, সবশেষে আমার।

চিত্রগ্রীবের স্বভাব বেশ ভালো করেই জানতো হিরণ্যক। এমন গুণ আছে বলেই না সে পায়রাদের রাজা হতে পেরেছে। বন্ধুর গর্বে বুকটা তার ফুলে উঠলো। তারপর ধারালো দাঁতে কুটুস কুটুস করে সকলের পায়ের বাঁধন কাটতে তার মিনিট কয়েকের বেশি দেরি হলো না।

চিত্রগ্রীব বললো, সত্যি বাঁচালে ভাই। কিন্তু আজ আর দেরি করবো না। বাড়িতে কেউ কিছু বলে আসিনি তো। শিগগিরই আর একদিন আসছি। মন খুলে খুব গল্প করা যাবে তখন। কিছু মনে করো না যেন। চলি।

ঝাঁক বেঁধে সবাই বাসার দিকে উড়ে গেল।

সব দেখে শুনে কাকের মুখে আর ভাষা যোগায় না। ধন্যি পায়রা সর্দার! একজন বন্ধু পেয়েছে বটে। এমন বন্ধু পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা। লঘুপতন মনে মনে ঠিক করলো, যে করেই হোক, হিরণ্যকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেই হবে।

বন্ধুর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসেছিল হিরণ্যক। হঠাৎ একটা কাককে তার দিকে উড়ে আসতে দেখে পলকের মধ্যে সে আবার গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তা দেখে লঘুপতন প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলো, শোনো শোনো, পালিও না ভাই। আমি তোমার কিচ্ছু ক্ষতি করবো না। শুধু আমাকে তোমার বন্ধু করে নাও।

গর্ত থেকেই হিরণ্যক জবাব দিল, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব! চালাকি করার আর জায়গা পাও নি, না? বন্ধুত্ব করতে আমি গর্ত থেকে বেরিয়ে আসি, আর অমনি তুমি টুক করে আমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাও, এই তো! অত বোকা আমাকে পাওনি। যাও, কেটে পড়ো দেখি।

এখন কি করে লঘুপতন বোঝায় তার মনের কথা! যতোই সে কাকুতি-মিনতি করে, দিব্যি করে, এমনকি গর্তের কাছে মাথা খুঁড়তে থাকে, হিরণ্যক কিছুতেই বিশ্বাস করে না তার কথা। আর করবেই বা কি করে। জীবনে কাকের কাণ্ড-কীর্তি তো কিছু কম দেখে নি সে। এদিকে লঘুপতনও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত হিরণ্যককে কিছুতে বোঝাতে না পেরে সে মরিয়া হয়ে বললো, ঠিক আছে, ভাই। এই বসে রইলাম তোমার গর্তের মুখে। তুমি বন্ধু বলে না মানলে আমি আর কোথাও নড়ছি না। আমার খাওয়া-দাওয়াও আজ থেকে ঘুচলো। দেখি, আমার মরা মুখ দেখে শেষপর্যন্ত তোমার মন গলে কিনা।

একদিন গেল, দুদিন গেল, হিরণ্যক দেখলো, সত্যি তো কাকটা কোথাও নড়ছে না। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, উদাস হয়ে ঠায় এক জায়গায় তেমনি বসে আছে। এমন কি জল পর্যন্ত

খেতেও যায় না যে! এমন করলে তো সত্যি কাকটা নির্ঘাৎ মারা পড়বে তাহলে। হিরণ্যকের ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। এমন লোককে নিয়ে তো পারা মুস্কিল! তিনদিনের দিন হিরণ্যক গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বললো, তাই হোক, বন্ধু, তোমার কথাই রইলো। এরপর তুমি জানো, আর তোমার ধর্ম জানে।

হিরণ্যকের কথা শুনে লঘুপতন আনন্দে অমনি কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে নিল।

দিনের পর দিন ওরা এক সঙ্গেই থাকে। খায়, দায়, বেড়ায়, গল্পগুজব করে। নতুন বন্ধুকে পেয়ে কাক তার পুরনো সঙ্গীদের একেবারে ভুলে গেছে। এদিকে আর সব পশু-পাখিরা এদের এই উদ্ভট বন্ধুত্ব দেখে অবাক হয়, নানা কথা বলাবলি করে। এরা কিন্তু তাতে কান দেয় না, নিজেদের মধ্যে মশগুল হয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে এমনি করে একটা বছরও ঘুরে এলো।

চিত্রগ্রীবও আসে মাঝে মাঝে। তখন এদের আড্ডা আরো জমে ওঠে। তার সঙ্গে লঘুপতনেরও বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠেছে।

সুখ-দুঃখের কথায় তিনজনের যে তখন কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়, টের পাওয়া যায় না।

কিন্তু চিত্রগ্রীব তার আস্তানা ছেড়ে, দলবল ছেড়ে বেশিদিন বাইরে থাকতে পারে না। মাঝখানে অনেকদিন তার পাত্তাও পাওয়া যায় নি। একদিন লঘুপতন প্রস্তাব করলো, একজায়গায় আর বেশিদিন ভালো লাগছে না, মিতে। চলো, একটা নতুন জায়গায় যাই।

হিরণ্যক শুধালো, বেশ তো আছি। কোথায় আবার যাবে শুনি?

লঘুপতন বললো, খুব ভালো জায়গায় নিয়ে যাবো তোমাকে। মন্থরক বলে আমার এক কচ্ছপ-বন্ধু থাকে সেখানে। খুব ভালো লোক। তোমার খুব পছন্দ হবে তাকে, দেখো।

বন্ধুর সাধ হয়েছে যখন, হিরণ্যক আর আপত্তি করলো না। শুধু বললো, চিত্রগ্রীবকে আমাদের ঠিকানাটা দিয়ে যেতে হবে।

কাকের পিঠে চড়ে ইঁদুর একদিন হাজির হলো কচ্ছপের দেশে। বেলা তখন প্রায় পড়ে এসেছে। বড়ো একটা দীঘির পাড়ে বসে কচ্ছপ মন্থরক তখন রোদ পোয়াচ্ছিল আর খোলসের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে লম্বা মুখ বার করে আশ-পাশটা দেখে নিচ্ছিল। লঘুপতনকে দেখতে পেয়ে খুশিতে তার লম্বা গলা আরো লম্বা হয়ে গেল। জলের ধার থেকে অমনি সে গুটি গুটি উঠে এলো ডাঙায়। একটু অভিমান ভরে কাককে বললো, এই যে! এতদিন পরে বন্ধুকে মনে পড়লো?

তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে লঘুপতন বললো, রাগ করো না, ভাই। সত্যি অনেকদিন আসতে